নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (সা. আ.) এর পবিত্র জন্মদিন এবং বিশ্ব নারী দিবস

ড. সামিউল হক

সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য হযরত ফাতেমা (সা.আ.) অনুকরণীয় আদর্শ। আর তাই তাঁর জন্মদিনটি সকল মুসলমানই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকেন। যদিও প্রতি বছর মার্চ মাসের ৮ তারিখে বিশ্বব্যাপী নারী দিবস পালিত হয়, তবে নবীর আহলে বাইতের অনুসারিগণ হযরত ফাতেমার(সা.আ.) জন্মদিনকে কেন্দ্র করেই নারী দিবস বা মা দিবস পালন করে থাকেন এবং আরবি মাসের সাথে সৌর মাসের মিল না থাকার কারণে প্রতিবছর এ দিবসটি আরবি মাসের তারিখের উপর ভিত্তি করেই পালিত হয়। আর যেহেতু এবছর ২০শে জমাদিউস সানি দিনটি পড়েছে ২৪শে জানুয়ারি সোমবার তাই এ দিনটি উপলক্ষ্যে আমরা বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে জানাই শীতকালীন উষ্ণ শুভেচ্ছা।

জন্মদিন পালনের কারণ

জন্মদিন পালন করা মানুষের সহজাত প্রবণতারই অংশ; ঠিক যেভাবে মানুষ তার বাবা, মা, স্ত্রী ও সন্তানের জন্মদিনকে স্মরণ করে আনন্দানুষ্ঠান পালন করে থাকে একইভাবে তার প্রিয়জন ও আদর্শবান ব্যক্তিত্বের জন্মদিনকে স্মরণ করেও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে। মহান আল্লাহ কয়েকজন মানুষকে সবধরনের পূর্ণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁরা হন মানুষের জন্য আদর্শ। নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (সা.আ.) এমনই একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বে তাঁর অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ পালন করে থাকেন নারী দিবস বা মা দিবস। গবেষণা করে পাওয়া যায় যে, যাঁরা জন্মদিন পালন করাকে 'বেদআত' বলে ফতোয়া দেন তাঁদের মূল যুক্তি হলো: জন্মদিনের অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও শরিয়তবিরোধী কাজ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের সেই যুক্তির বিপরীতে বলা যায়: যদি তাতে শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ না করা হয় এবং মহান ব্যক্তিবর্গকে স্মরণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে কোনোভাবেই তাকে 'বেদআত' বলা যাবে না বরং এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

এক নজরে ফাতেমা (সা. আ.)

নবীকন্যা ফাতেমা (সা.আ.) এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সম্পর্কে হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই লিখলেও তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। তাই এ পর্যায়ে একনজরে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি:

নাম: ফাতেমা, সিদ্দীকা, মুবারেকাহ, তাহিরাহ, যাকিয়্যাহ, রাযিয়্যাহ, মারযিয়্যাহ, মুহাদ্দিসাহ এবং যাহরা (আমালি সাদুক/৬৮৮)।

ডাক নাম: উম্মুল হাসান, উম্মুল হোসাইন, উম্মুল মুহসিন, উম্মুল আইম্মাহ এবং উম্মে আবিহা (কাশফুল গুম্মাহ, ২/১৮)।

উপাধিসমূহ: বাতুল, সিদ্দিকা, কুবরা, আযরা, তাহিরা এবং সাইয়্যেদাতুন নিসা (মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব, ৩/১৩৩)।

পিতা: নবী করিম হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (স.)।

মাতা: ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম নারী ও নবীপত্নী খাদিজাতুল কুবরা।

জন্মস্থান: মক্কা নগরী ও জন্ম তারিখ: নবুওয়াতের পঞ্চম বছর (প্রাগুক্ত: ৩/১৩২)। আরবি জমাদিউস সানি মাসের ২০ তারিখ শুক্রবার, মক্কার প্রস্তরময় পর্বতের পাদদেশে কাবার সন্নিকটে, ওহী নাযিলের গৃহে মা খাদিজার গর্ভ থেকে নবীনন্দিনী ফাতেমা যাহরা জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ফাতেমা (সা.আ.) এর জন্মের ফলে নবীর গৃহ আগের চেয়ে

আরো অধিক দয়া ও স্নেহ-মমতার আধারে পরিণত হয়। তিনি তাঁর পিতার কষ্টের দিনগুলোতে প্রশান্তি যোগাতেন। এবিষয়ে নবী করিম(স.) বলেন,

‘ফাতেমা আমার প্রাণের সমতুল্য, তার কাছ থেকে আমি বেহেশতের সুঘ্রাণ পাই।’ (কাশফুল গুম্মাহ, ২/২৪)।

নবীকন্যা হযরত ফাতেমার সঙ্গে ইমাম আলীর বিবাহ

যখন নবীকন্যা বিবাহের বয়সে উপনীত হলেন, নবী করিম(স.) এর একাধিক সাহাবি তাঁর পবিত্র কন্যাকে বিবাহ করে সম্মানিত হবার জন্য নবীকে তাগাদা দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাবে তেমন কোনো সাড়া দিচ্ছিলেন না। নবী করিম (স.) ঘোষণা দিলেন যে, ফাতেমার বিয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে এবং তিনি এ ব্যাপারে কিছুই করবেন না। এ ঘোষণা শোনার পর তাঁরা ফাতেমাকে বিয়ের প্রস্তাব থেকে নিবৃত হলেন এবং অনুধাবন করছিলেন যে, নবীর সাথে হযরত আলীর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং দ্বীনের পথে তাঁর যে কঠোর সংগ্রামের ভূমিকা রয়েছে তাতে আলীই হবেন ফাতেমার উপযুক্ত পাত্র।

অবশেষে নবী করিম (স.) সাহাবিদেরকে বললেন, আল্লাহ তাঁর কন্যাকে হযরত আলীর সাথে বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর বললেন, “আল্লাহর ফেরেশতা আমার কাছে এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং বলেছেন, মা ফাতেমা এবং আলীকে আমি জান্নাতে বিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আপনি তাদেরকে দুনিয়াতে বিয়ে দিন।’ ” (মোস্তফা কামাল অনূদিত, মা ফাতিমা/৬৭)

জান্নাতের নেত্রী নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (সা. আ.)

নবীকন্যা ফাতেমা(সা.আ.) নবী করিম(স.) এর বংশধারার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, কারণ, তাঁর মাধ্যমেই নবী(স.) এর বংশধারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। হাদিসে চারজন নারীকে বেহেশতের নেত্রী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে:

أفضَلُ نساءِ الجنّةِ أربعٌ: مريمُ بنتُ عمرانَ، وخديجةُ بنتُ خوَيْلِد، وفاطمةُ بنتُ مَحمّد، وآسيةُ

নবী (স.) এর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে: ‘বেহেশতের নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী চারজন: মারিয়াম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ও আছিয়া।’ (মুত্তাকি হিন্দি, কানজুল উম্মাল, ১২/১৪৪) অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে: নবীকন্যা ফাতেমা(সা.আ.) শুধু জান্নাতি নারীদের নেত্রীই নন; বরং তিনি বিশ্বজাহানের নারীদের নেত্রী। আর নবীকন্যা ফাতেমার দুই সন্তান ইমাম হাসান ও হোসাইন(আ.) যে জান্নাতের যুবকদের নেতা তাতে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাই বলা যায় যে, পরকালের কাণ্ডারি নবী করিম(স.) যখন কেয়ামতের দিন শাফায়াত করবেন তখন তাঁর পাশে থাকবেন তাঁরই কন্যা, সন্তানদ্বয় ও ইমাম আলী(আ.)। কারণ, সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأبوهما خير منهما."

নবী করিম(স.) বলেছেন : হাসান ও হোসাইন(আ.) বেহেশতী যুবকদের সর্দার। আর তাদের পিতা তাদের চেয়েও উত্তম।[১]

এই মহীয়সী নারীর গুণ বলে শেষ করা যাবে না। সহীহ হাদিসের পাশাপাশি পবিত্র কোরআনে তাঁর শানে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তার তাফসির করলে, এমনকি শুধু তার অনুবাদ অধ্যয়ন করলেই ফাতেমা যাহরার শান ও মর্যাদা সকল মুসলমানের কাছে সুস্পষ্ট হবে। দৈনিক যুগান্তরের এক প্রাবন্ধিক, ‘জান্নাতের নেত্রী হযরত ফাতেমা যাহরা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধের শুরুতে এভাবে লিখেছেন, ‘যে নুরের আকর্ষণে সারা জাহান মাতোয়ারা, যে নুরের আলোতে আলোকিত আশি হাজার মাখলুক, সিরাজুম মুনিরা হিসেবে যে নুর উদ্ভাসিত, সে নুরের সরাসরি অংশ ফাতেমাতুয যাহরা(রা.)।’ (দৈনিক যুগান্তর, ২৮/২/২০২০)

নবীকন্যা হযরত ফাতেমার বিশেষত্ব, চরিত্র ও কর্ম-পদ্ধতি

নবীকন্যা হযরত ফাতেমা(সা.আ.) এর চরিত্র ও কর্ম-পদ্ধতির বর্ণনায় অসংখ্য বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রবন্ধের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে এসব বিশেষত্বের শুধু সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ করব: ১- যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা, ২-বাড়ির কাজ নিজের হাতে সম্পাদন, ৩-অত্যধিক ইবাদাত ও অপরের জন্য দোয়া, ৪- নিজ হিজাবের সুরক্ষা, ৫- সতীত্ব ও বেগানা পুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা, ৬- নিজের সম্পদ ও অলংকার আল্লাহর রাস্তায় দান করার স্পৃহা, ৭-

পোশাকাদি ও বিশেষত বিয়ের পোশাক ভিক্ষুককে দান, ৮- তাকওয়া অর্জনে উদ্গ্রীব, ৯- আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি ছিলেন নবীর জন্য কাউসারের ঝরনাধারা যার মাধ্যমে নবীর বংশধারা আজো বিশ্বে বিরাজমান, ১০- আদর্শ গৃহিণী বা স্ত্রী, ১১- আদর্শ জননী, ১২- আদর্শ সমাজ সেবিকা ও ১৩- সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী রমণী, ১৪- অগণিত কোরআনের আয়াত নাযিলের শান ও মর্যাদার অধিকারিণী, ১৫- উম্মে আবিহা: স্নেহময়ী জননীর মতো নবী করিমের (স.) সেবা-যত্ন করা এবং বিপদের সময় তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য মহীয়সী নারী ফাতেমা(সা.আ.) এর অন্যতম নাম উম্মে আবিহা অর্থাৎ তাঁর পিতার জননী। অনুরূপ অগণিত বিশেষত্ব নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (সা. আ.) এর শানে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর দরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদার কারণে নবী (স.) তাঁকে দেখলে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তিনি বলেছেন, 'ফাতেমা আমার দেহের অংশ, যা কিছু তাকে সন্তুষ্ট করে তা আমাকে সন্তুষ্ট করে এবং যা কিছু ফাতেমাকে কষ্ট দেয় তা আমাকে কষ্ট দেয়, আর যা আমাকে কষ্ট দেয় তা আল্লাহকেও কষ্ট দেয়।' (বুখারি/৩৭১৪, মুসলিম ২৪৪৯)। এ পর্যায়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করব যাতে বুঝা যাবে যে, ফাতেমার (সা.আ.) অন্তর ছিল আল্লাহর প্রতি ইমান ও ইয়াকিনে পূর্ণ:

হযরত আবুযর গিফারি(রা.) বলেন: একবার রাসূল (স.) আলীকে ডাকার জন্য আমাকে পাঠান। আলীর গৃহে এসে তাঁকে ডাকলে কেউ আমার ডাকে সাড়া দিল না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম তার বাড়ির হস্তচালিত যাঁতাকলটি নিজে নিজেই ঘুরছে অথচ এর পাশে কেউ ছিল না। তখন আবার তাঁকে ডাকলাম। আলী ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন। আমি তাঁকে নবীর কথা বললে তিনি নবীর সাথে দেখা করার জন্য যাত্রা করলেন। নবী (স.) এর কাছে পৌঁছলে তাঁর সাথে নবী(স.) কথোপকথন করলেন এবং এমন কিছু বললেন যা আমি বুঝতে পারলাম না। তখন আমি নবী(স.) এর কাছে প্রশ্ন করলাম: 'হে নবী, আলীর গৃহে হস্তচালিত যাঁতাকলটি দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। যাঁতাকলটি কীভাবে নিজে নিজেই ঘুরছিল অথচ এর পাশে কেউ ছিল না?!

নবী(স.) বলেন, 'আমার কন্যা ফাতেমা এমন একজন রমণী যার অন্তর ও সর্বাঙ্গকে ইমান ও ইয়াকিনে পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ ফাতেমার অক্ষমতা ও দৈহিক দুর্বলতার ব্যাপারে অবহিত। তাই তিনি তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে গায়েবিভাবে সাহায্য করে থাকেন। তুমি কি জান না আল্লাহর এমন অনেক ফেরেশতা আছেন যাঁরা মুহাম্মাদের বংশকে সাহায্য করার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত?' (চৌদ্দ মাসুম আ. এর জীবনী/১৪৫)

ফাতেমা (সা.আ.) ও নারী স্বাধীনতা

জাহেলিয়াতের যুগে আরব নারীরা সকল প্রকার জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হতো। অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো। নিম্নে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের সঙ্গে করা সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম নির্যাতনটি ছিল জীবন্ত কন্যাসন্তানকে কবর দেওয়া। কিছু আরব গোত্র তাদের ঘরে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কবর দিয়ে দিত। তাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি প্রথা ছিল যে, কন্যাকে কবর দেওয়া মহত্ত্বের অংশ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করে বলেন:

আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে– কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? (সূরা তাকভীর/৮-৯)

কিন্তু ইসলাম আগমনের পর বিশেষত মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর এ প্রথা চিরতরে রহিত হয়। এমনকি ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর মেয়েরা এতই সম্মানিত হয়েছিল যে, কোনো নারীকে দেখলেই পুরুষরা তাকে মা বলে সম্বোধন করতেন এবং তাকে মায়ের মতোই সম্মান করতেন। এই আচরণের শিক্ষা মুসলমানরা নবী(স.) এর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। কারণ, ফাতেমা(সা.আ.) কে তিনি মা বলে সম্বোধন করতেন এবং বাস্তবে তাঁকে মায়ের মতোই সম্মান করতেন। আর তাই ফাতেমার অন্যতম উপাধি হলো: উম্মে আবিহা অর্থাৎ তাঁর পিতার জননী।

নবী করিম (স.) এর কাছে ফাতেমার সম্মান

নবীপত্নী হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'যখনি হযরত ফাতেমা(সা.আ.) নবীর (স.) কাছে আসতেন তখনি তিনি ফাতেমার সম্মানে উঠে দাঁড়াতেন এবং ফাতেমার মাথায় চুমু খেতেন, অতঃপর তাকে নিজের স্থানে বসাতেন। আবার যখন নবী (স.) ফাতেমার সাক্ষাতে গমন করতেন তখন তাঁরা পরস্পরের মুখে চুম্বন করতেন এবং পাশাপাশি বসতেন।' (মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব, ৩/১১৩)।

সর্বোপরি ফাতেমা(সা.আ.) এটা প্রমাণ করেছেন যে, পরিপূর্ণতার শিখরে ওঠার জন্য পুরুষ হওয়া জরুরি কোনো শর্ত নয়। তিনি এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন যখন আরবরা নারীকে মনে করত কেবল ভোগের সামগ্রী এবং কিছু আরব গোত্র তাদের ঘরে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে অমর্যাদার ভয়ে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত বা গোপনে মেরে ফেলত। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের ঘরে একজন কন্যাসন্তান পাঠিয়ে নারী জাতির জন্য অশেষ সম্মান ও মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন।

উপসংহার: যদিও প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে থাকে, যার ইতিহাসে নিবন্ধিত রয়েছে যে, ১৯০৮ সালে নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমে আসে প্রায় ১৫ হাজার নারী। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছিল নারীর মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা এবং কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। কিন্তু আরবিয় জাহেলী যুগের নারীদের প্রতি যে অবমাননা এবং জুলুম হয়েছে সেই পরিবেশে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর ঘরে ফাতেমা (সা.আ.) কে প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমেই নবীর বংশ বিস্তার করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতঃ যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন সে বিষয়ের প্রতি যদি আমরা মনোনিবেশ করি তবে ফাতেমা (সা.আ.) এর জন্মদিনটাই নারী দিবস ঘোষণা দেবার দাবি রাখে।

কী ওয়ার্ড: নবীকন্যা, নবী করিম, ফাতেমা, জন্মদিন ও নারী দিবস।

টীকা :

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪। অন্যান্য সূত্র এরূপ : দুররুল মানসুর, খণ্ড ৪, পৃ. ২৬২; তারিখে বাগদাদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৮

ইমাম খোমেইনী (র.) ও ইরানের ইসলামি বিপ্লব

মো. আশিফুর রহমান

আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে ১৯০১ সালের ২৩ অক্টোবর (১৩২০ হিজরির ২০ জমাদিউস সানি) ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ২২৫ কি.মি. দক্ষিণে খোমেইন শহরে জন্মগ্রহণ করেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যাঁর নাম রুহুল্লাহ মুসাভী খোমেইনী, যিনি পরবর্তীকালে ইমাম খোমেইনী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর পিতা আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুস্তাফা মুসাভী একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ আলেম ছিলেন। ইমামের শিশুকালেই তাঁর পিতা শাহাদাতবরণ করেন। ভূ-স্বামীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে ইমাম খোমেইনীর পিতাকে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে ইমাম খোমেইনী তাঁর ফুফু ও বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। তাঁর বড় ভাই আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুর্তাজাও একজন প্রাজ্ঞ ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন।

ইমাম খোমেইনী ছিলেন প্রচণ্ড ধীসম্পন্ন। মাত্র সাত বছর বয়সে সম্পূর্ণ কোরআন পড়া শেষ করে আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এরপর বড় ভাইয়ের কাছে তিনি যুক্তিবিদ্যা, আরবি ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য আরাকে গমন করেন। সেখানে স্বনামধন্য আলেমদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এক বছর পর ইরানের ধর্মীয় নগরী কোমে চলে আসেন। সেখানে ১৫ বছর তিনি আয়াতুল্লাহ্ হায়েরীর দারসে খারেযে (মুজতাহিদ হওয়ার পড়াশুনা) যোগ দেন। এরপর তিনি আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদীর ক্লাসে যোগ দেন। তিনি আয়াতুল্লাহ্ আলী আকবর ইয়াযদীর কাছে জ্যোতির্বিদ্যা এবং মরহুম শায়খ মুহাম্মদ আলী শাহবাদীর কাছে দর্শন ও রহস্যজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন।

এভাবে অল্প সময়েই মধ্যেই তিনি ধর্মতত্ত্ব, ইসলামি আইন, হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্র, রহস্যজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে একজন অসামান্য পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তিনি বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি এসবের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার চর্চা করেন। এসময়কালে তিনি নিজেও বিভিন্ন বিষয়, যেমন আইনশাস্ত্র, ইরফান, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষাদান করতেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে ইমাম খোমেইনী দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তৎকালীন ইরানের অবস্থা

ইমাম খোমেইনী যখন জ্ঞান অন্বেষণে ব্যস্ত সেসময়ে ইরানের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ছিল পুরোপুরি ইসলামি আদর্শের বিপরীতে। মদপানের জন্য বার, নাইটক্লাব ইত্যাদি সবখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। নারীদেরকে বেপর্দায় চলাফেরায় বাধ্য করা হতো। সমাজের সর্বত্র ইসলামি মূল্যবোধের পরিবর্তে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছিল। অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আমেরিকা-ব্রিটেনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তেলসম্পদের বিরাট লভ্যাংশ ব্রিটেন ও মার্কিন তেল কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।

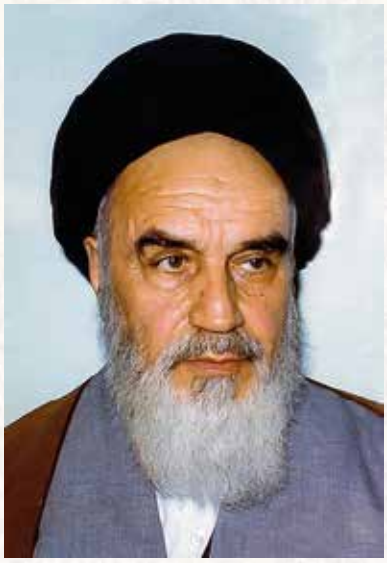

এসব কর্মকাণ্ডের ফলে শাহের রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা আন্দোলনও গড়ে ওঠে। ১৮৯২ সালে আলেমদের নেতৃত্বে তামাকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। মীর্যা হাসান সিরাজী তামাক বর্জনের ফতোয়া দেন। ১৯০৩ সালে কোরআনভিত্তিক সংবিধান রচনার দাবিতে শুরু হয় শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন। ১৯৫২-৫৩ সালে তেলসম্পদ জাতীয়করণের আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে মোহাম্মদ রেজা ইরান থেকে পলায়ন করে। ব্রিটিশরা এ অবস্থায় ইরানের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না জেনে ইরানের ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেয়। সিআইএ দ্বারা পরিচালিত সামরিক অভ্যুত্থানে মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটে এবং মোহাম্মদ রেজা আবার ইরানে ফিরে এসে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

এ সময়কালের মধ্যে মীর্যা হাসান সিরাজী, সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বিহবিহানী, সাইয়্যেদ তাবতাবায়ী, শেখ ফাজলুল্লাহ্ নূরী, আয়াতুল্লাহ্ কাশানী, আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদী প্রমুখ খ্যাতনামা আলেম এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ইমাম খোমেইনীর আন্দোলন

১৯৪১ সালে কাশফুল আসরার (রহস্য উন্মোচন) নামক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে ইমাম খোমেইনী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের যাত্রা শুরু করেন। এতে তিনি বলেন, 'একমাত্র ধর্মই মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও

কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এ কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য গণভোটের আয়োজন করে। একে 'শ্বেত বিপ্লব' বা 'শাহ ও জনতার বিপ্লব' নাম দেওয়া হয়। বিপ্লবীরা একে শ্বেত বিপ্লব বলতেন এ অর্থে যে, তা হোয়াইট হাউসে জন্মলাভ করেছিল।

ইমাম খোমেইনী ভোট বর্জনের ডাক দেন। জনগণ ভোটদান হতে বিরত থাকে। সে বছরই ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষে ইমাম শাসকগোষ্ঠীর বেআইনি ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। ইমামের নেতৃত্বে ইরানের ইসলামি উম্মাহ্‌র প্রতিরোধে শাহ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।

১৯৬৩ সালের পূর্বে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ না হওয়ার পেছনে প্রকৃত কারণ ছিল এ সময় ইমাম খোমেইনী আলেম সমাজের মধ্যে এক চিন্তাগত নীরব বিপ্লব সাধন করছিলেন। তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৬৩ সালে আলেমরা ঘোষণা করেন যে, এ বছর সপ্তাহব্যাপী নওরোজ পালন করা উচিত নয়। কারণ, নববর্ষের ২য় দিন ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী। জনগণ এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

১৯৬৩ সালের ২২ মার্চ নওরোজের দ্বিতীয় দিন ফায়জিয়া মাদ্রাসায় ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করে। শাহের লোকেরা এ অনুষ্ঠানে আক্রমণ করে অনেককে হত্যা ও আহত করে। শুধু তাই নয় কয়েকদিন পর যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল তাদেরকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়।

অপরাধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত যারা ইরানের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, তারা মেকী ধর্মে বিশ্বাস করেন অথবা তাদের আদৌ কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই।'

ইমাম খোমেইনী তাঁর ছাত্রদের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং রূহানি শক্তি ও নৈতিকতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতেন। পরবর্তীতে তিনি নীতিশাস্ত্র এবং আত্মিক জ্ঞানের ক্লাস চালু করেন। তাঁর ক্লাসে শত শত ছাত্র, এমনকি মুজতাহিদরাও যোগ দিতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ক্লাসে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতি রেজা খানের নিরাপত্তা পুলিশকে আতঙ্কিত করে এবং তারা লোকদেরকে এ থেকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস চালায়। এমনকি ক্লাসটি বন্ধ করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়।

কোমের ফায়জিয়া মাদ্রাসা থেকে কোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজী মোল্লা সাদিক মাদ্রাসায় নীতিশাস্ত্রের ক্লাসগুলো স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত পুলিশ এ চাপ অব্যাহত রাখে। রেজা শাহের পতন ও নির্বাসনের আগ পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। এরপর আবার ফায়জিয়া মাদ্রাসায় ক্লাস চালু হয়। এসব ক্লাসের বক্তৃতা পরবর্তীতে 'নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' ও 'আল জিহাদুল আকবার' নামে সংকলিত হয়।

ইমাম খোমেইনী শাহের ধর্মবিরোধী ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান এবং আলেমরাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে ৯ জানুয়ারি শাহের সরকার ছয় দফা সংস্কার

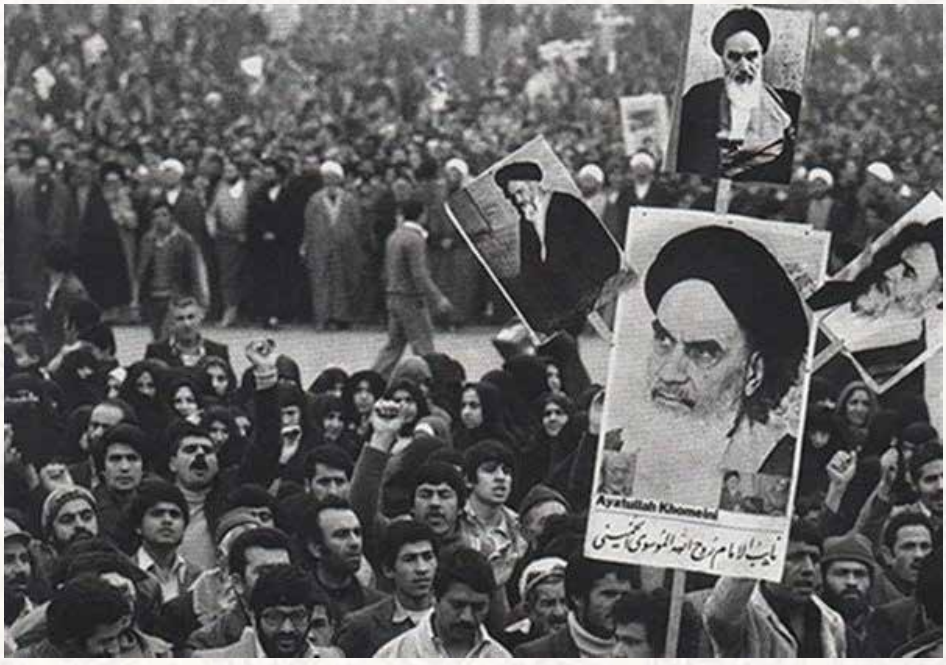

এ ঘটনার চল্লিশতম দিনে সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এর পরপরই আশুরা সমাগত হয়। সাভাক বাহিনী হুকুম দেয় যে, ফায়জিয়া মাদ্রাসায় ইমামের বক্তৃতা দেওয়া চলবে না। ইমাম এ অন্যায় আদেশ উপেক্ষা করে আশুরার বিকেলেই মাদ্রাসা ফায়জিয়ায় পৌঁছান। ইমাম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে, তারা ইসলাম ও ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরোধী। ইসরাইল আমাদের পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল কোরআনকে হেয় করতে চায় এবং ধর্মীয় নেতৃত্বকে নির্মূল করতে চায়। ইসরাইল আমাদের অর্থনীতি, ব্যবসা ও কৃষিকে পাকাপোক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।'

ইমামের ভাষণে জনগণ ক্রোধে ফেটে পড়ে। রাতে ইমামকে গ্রেফতার করা হয়। মুহূর্তে খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জনতা স্লোগান তোলে : 'হয় খোমেইনী, না হয় মৃত্যু।' তেহরানে বিশাল মিছিল হয়। বিশ্ববিদ্যালয়, দোকানপাট বন্ধ থাকে। সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৬৩ সালের ৫ জুন গণবিক্ষোভে গুলি বর্ষণ করলে তেহরানে ১৫০০০ ও কোম শহরে ৪০০ লোক শাহাদাতবরণ করে। জনগণের দাবির মুখে ১৯৬৪ সালের ৭ এপ্রিল শাহ ইমামকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ক্যাপিটিউলেশন আইন

১৯৬৪ সালের ১৩ অক্টোবর ইরানি পার্লামেন্টে ইরানে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আইন পাশ করা হয়। এ আইনে মার্কিন নাগরিকদের বিচার করার কোনো ক্ষমতা ইরান সরকারের থাকবে না এবং তাদের বিচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

ইমাম এর বিরোধিতা করে বক্তৃতা রাখেন। তিনি বলেন, 'এহেন অপমানের প্রতিবাদ করার ভার এখন ইসলাম প্রচারক ও বক্তাদের উপরই ন্যস্ত। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে দেশের স্বাধীনতার জন্য কলম ধরতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের উচিত পার্লামেন্টে গৃহীত সিদ্ধান্তের পেছনে কী রহস্য নিহিত রয়েছে, সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। এ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি সর্বসম্মত নীতি গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ইসলাম ও কোরআনের গৌরব বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং একই সাথে মুসলমানদের সমর্থনে কাজ করে যাওয়া উচিত।'

ইমাম সেনাবাহিনীকে জেগে উঠে শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানান। শাহ বুঝতে পরল যতদিন ইমাম দেশে আছেন ততদিন জনগণের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাবে না। তাই আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ইমামকে নির্বাসনে পাঠানোর কথা ভাবল। ১৯৬৪ সালের ৪ নভেম্বর ইমামকে কোম থেকে গ্রেফতার

করে তুরস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সৈন্যরা ধর্মীয় নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করে। ইমাম খোমেইনীর জ্যেষ্ঠপুত্র মোস্তফা খোমেইনীও গ্রেফতার হলেন। দু'মাস পর তাঁকেও তুরস্কে নির্বাসন দেয়া হয়।

১৯৬৫ সালের অক্টোবরে তুরস্ক সরকার তাঁকে ইরাকের নাজাফে প্রেরণ করে। সেখানে তিনি ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর বাণী ইরানে প্রেরণ করতেন এবং আলেমরা তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেন।

ইমাম খোমেইনীকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোস্তফা খোমেইনীকে ১৯৭৭ সালের ২৩ অক্টোবর বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারী ইমাম খোমেইনীর মর্যাদা নষ্ট করে পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইমামকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার দালাল বলে উল্লেখ করা হয়।

এর প্রতিবাদে কোমে বিক্ষোভ হয় এবং ২০০ লোক শাহাদাতবরণ করেন। কোমের শহীদদের স্মরণে তাবরীজে বিক্ষোভ হয়। এতে ৫০০ জন শহীদ হন। এরপর ইরানের প্রতিটি শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। শত শত লোক শহীদ হয়।

১৯৭৮ সালের মুহররম মাসে লাখ লাখ মানুষ তেহরানের রাস্তায় নেমে আসে। নিরস্ত্র জনতা কাফনের কাপড় পড়ে মেশিনগান সজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে ছুটে যেতে থাকে। ৮ সেপ্টেম্বর ৫০০০ লোক শাহাদাতবরণ করে।

অক্টোবর মাসে ইমামকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করা হয়। যদিও ইমাম কোনো মুসলিম দেশে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো মুসলিম দেশ ইমামকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। তাই তিনি ফ্রান্সের প্যারিসে চলে যান।

সেখান থেকে ইমামের বাণী রেকর্ড করে ইরানে প্রেরণ করা হতো। তেহরানের বহু লোক ফোনে সরাসরি তাঁর কথা রেকর্ড করে রাখতেন। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে গ্রাম-গ্রামান্তরে তা পৌঁছে দিতেন।

১৯৭৮ সালের ৪ নভেম্বর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইমামকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে মিছিল করে। শাহের বাহিনী এ মিছিলের উপর গুলি করলে ৬৫ জন ছাত্র শহীদ হয়। এরপর মুহররম ৯ ও ১০ তারিখ (১৯৭৯) পুনরায় বিক্ষোভ হয়। ইমাম তাঁর প্রেরিত বাণীতে বলেন : 'মুহররম হলো তরবারির উপর রক্তের বিজয়ের মাস'।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সারা দেশে কার্ফু ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পারে যে, কার্ফু মানা হবে না। তাই তা প্রত্যাহার করা হয়। প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মিছিল করে উত্তর তেহরানের দিকে ধাবিত হয়। তারা শাসকদের ভবনগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়। শাহ বুঝতে পারে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। সে কট্টর ধর্মবিরোধী নেতা শাপুর বখতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে। সে শাহকে নিরাপদে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। শাহ আমেরিকায় কিছুদিন অবস্থান করে। আমেরিকার সরকার তার নিরাপত্তার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে। সে মিশরে আনোয়ার সাদাতের আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই মারা যায়।

ইমামকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণ বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। কিন্তু শাপুর বখতিয়ার এ দাবিকে উপেক্ষা করে। ইমাম বখতিয়ারের অনুমতি ছাড়াই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। বিমান বন্দরে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ইমামকে এ ব্যাপারে অবহিত করার পরও তিনি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ফ্লাইটে দেশে ফেরার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

শাপুর বখতিয়ার বিমান বন্দর বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেও বিমান বন্দরের কর্মচারীরা তা উপেক্ষা করে ইমামের বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করে দেয়। এভাবে ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ইমাম বিজয়ীর বেশে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ৬০ লক্ষ লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।

ইমাম প্রথমেই বিপ্লবের শহীদদের কবরস্থান বেহেশতে যাহ্‌রায় যান এবং সেখানে বক্তব্য রাখেন। তিনি রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও মজলিশকে অবৈধ ঘোষণা করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোণার আহ্বান জানান। তাঁদেরকে স্বাধীনতার দিকে উৎসাহিত করেন। তিনি মেহেদী বজারগানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বজারগান অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দেশে দু'টি সরকার অস্তিত্ব লাভ করে।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের দলত্যাগের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১০ ফেব্রুয়ারি বিমান বাহিনীর ক্যাডেটরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেনাবাহিনীর প্রধান দেশে সামরিক আইন জারির চিন্তা করে। ইমাম সামরিক আইন উপেক্ষা করে জনগণকে রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর অফিস, রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন স্টেশন, সংসদ ভবন, সাভাব বাহিনীর সদর দফতর ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলোতে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় ৮০০ লোক নিহত হয়। জনগণের প্রবল চাপে শাপুর বখতিয়ার রাতের আঁধারে পালিয়ে যায় এবং ১১ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পূর্ণ সফলতা লাভ করে। ১৯৭৯ সালের ৩০ মার্চ গণভোট হয় এবং দেশের ৯৮.২% জনগণ ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোটদান করে। ১ এপ্রিল ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লবের পরপরই খুব কম সময়েই মধ্যে আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহ্হারী, আয়াতুল্লাহ্ তালেকানী, আয়াতুল্লাহ্ বেহেশতীসহ বিপ্লবের প্রথম কাতারের ৭৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে শহীদ করা হয়। বোমা বিস্ফোরণে শহীদ করা হয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী রাজাই ও প্রধানমন্ত্রী ড. জাওয়াদ বাহোনারকে। বর্তমান রাহবার আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যে বিপ্লব ধ্বংসের জন্য এত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে আজও তা স্বমহিমায় টিকে আছে। শুধু তা-ই নয়, ইরান দিন দিন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শনৈঃশনৈ উন্নতির মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম শ্রেণির দেশগুলোর মাঝে স্থান করে নিতে নিজেকে সক্ষম করে তুলছে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট এবং প্রভাব

সিরাজুল ইসলাম

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে বিশ্বে যে মহাবিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছিল তার নাম ইরানের ইসলামি বিপ্লব। যখন সারা বিশ্ব রুশ-মার্কিন দুই শিবিরে বিভক্ত, বিশ্ববাসী যখন মার্কিন পুঁজিবাদ ও সোভিয়েত কমিউনিজমের যাঁতাকলে পিষ্ট, তখন 'না পশ্চিম, না পূর্ব' এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে একদল 'জানবাজ যোদ্ধা' ইরানে এই অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনার জন্ম দেন। আধুনিক বিশ্বের সেই নজিরবিহীন বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন ইরানের সিংহপুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম হযরত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ মুসাভি খোমেইনী। কী এক ঐশী ক্ষমতা দিয়ে তিনি পুরো ইরানি জাতিকে উন্মত্ত সাগরের ন্যায় জাগিয়ে তুললেন যার ফল হিসেবে ফেনিল তটে গোড়াপত্তন হলো ইসলামি বিপ্লবের। বহু জীবন আর রক্তের বিনিময়ে ইতিহাসের ইরান পেল সত্যিকারের স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদকে 'না' বলে দেওয়ার দুর্দমনীয় সাহস। যে শুভক্ষণে পাহাড়, সাগর আর জঙ্গলাকীর্ণ ইরানের ভূখণ্ড বিপ্লবের সোনালি আভায় উদ্ভাসিত হলো সেই শুভক্ষণটি হলো ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে, পতন ঘটে পাহলভি রাজবংশের শেষ শাসক মোহাম্মাদ রেজা খানের। ইরানে প্রতিষ্ঠা হয় জনগণের অংশগ্রহণে ইসলামি সরকার ব্যবস্থা।

রেজা শাহ ইরানের শাসন ক্ষমতায় বসেছিলেন ১৯৪১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি ১৯৬৭ সালের ২৬ অক্টোবর জন্মদিনে নিজেকে 'শাহানশাহ' বা 'রাজাদের রাজা' বলে ঘোষণা দেন। রেজা শাহ ছিলেন একজন সেক্যুলার ব্যক্তি। ক্ষমতায় বসে তিনি বিদেশি শাসক বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইসরাইলকে খুশি করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এর কারণ মূলত তাদের কৃপায় তিনি নিজ পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। দেশ শাসনের যোগ্যতা না যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল পরাশক্তির আনুকূল্য। ফলে দেশের মানুষের সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। নিজের গদি ঠিক রেখে যা খুশি তাই করার চিন্তাই ছিল প্রখর। এ কারণে ধীরে ধীরে তিনি জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন বিশেষ করে ইরানের আলেম সমাজের কাছ থেকে তিনি একেবারেই ছিটকে পড়েন। এছাড়া, শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষও তাকে পছন্দ করতেন না। তার বিরুদ্ধে লাগামহীন দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। দুর্নীতিতে তার আশপাশের লোকজন জড়িত ছিলেন; জড়িত ছিলেন তার পরিবারের লোকজন। প্রশাসনের এলিটরাও একইভাবে দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন। ফলে তার সরকার ইসলামি গণবিপ্লব সফল হওয়ার বেশ আগেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। এছাড়া, রাজনৈতিক কিছু কর্মকাণ্ড যেমন কমিউনিস্ট 'তুদেহ পার্টি'কে নিষিদ্ধ করা, ইসরাইলের সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিরোধী রাজনীতিকদেরকে গুপ্ত পুলিশ বাহিনী সাভাক দিয়ে নির্যাতন তার পতনের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে। সরকারি হিসাব মতে ১৯৭৮ সালে ইরানে রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যা ছিল ২,২০০ এর মতো, কিন্তু গণবিপ্লবের সময় সেই সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। ফলে ১৯৭৯ সালে দেশে গণ-অশান্তি বিপ্লবে রূপ নেয় এবং চূড়ান্তভাবে রেজা শাহের পতন ঘটে। ১১ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সফল হওয়ার আগে ১৭ জানুয়ারি তিনি দেশ থেকে পালিয়ে যান। জনশ্রুতি রয়েছে, রেজা শাহ নারীর বেশে দেশ থেকে পালিয়ে যান। দেশে ফিরে এলে মৃত্যুদণ্ডের আশংকা ছিল। সে ভয়ে রেজা শাহ দেশে ফিরে আসেন নি; অনেকটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় মিশরে তার মৃত্যু হয় এবং রাজধানী কায়রোয় তাকে দাফন করা হয়। সেখানেই দাফন করা হয়েছিল তার বাবাকেও।

ইরানের এই ভয়াবহ ক্ষমতাধর রেজা শাহের জীবন ছিল ভোগ বিলাসে ভরা। এর ছোট্ট নমুনা পাওয়া যাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করলে। ১৯৭১ সালে দেশে ইরানি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আড়াই হাজার বছর পূর্তি পালন করেন রেজা খান। সে সময় মার্কিন প্রভাবশালী দৈনিক 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' রিপোর্ট করেছিল ইরানি রাজতন্ত্রের আড়াই হাজার বছর পূর্তিতে রেজা শাহ পাহলভি তখনকার দিনে ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি ডলার খরচ করেছিলেন। ইরানের প্রাচীন ও সুবিখ্যাত পার্সেপোলিস গেইটের কাছে ১৬০ একর জমিতে 'তাঁবুর শহর' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশমতো বিশালাকারের তিনটি

রাজকীয় তাঁবু এবং ৫৯টি লেজার দিয়ে তাঁবুর শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারার আকৃতিতে সাজানো হয় তাঁবুর শহরকে। ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাক্সিম থেকে বাবুর্চি আনা হয় এবং এসব বাবুর্চি রাজ পরিবারের সদস্য ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা রাজকীয় মেহমানদের জন্য খাবার তৈরি করে। তাঁবুর শহর সাজানোর কাজ করে মাইসন জ্যানসেন কোম্পানি যারা জ্যাকুইলিন কেনেডির জন্য হোয়াইট হাউজের ডেকোরেশনের কাজ করেছিল। মেহমানদের খাবার-দাবার পরিবেশন করা হয়েছিল ফ্রান্সে তৈরি অভিজাত বাসনকোসনে। এছাড়া মদপানের আয়োজন করা হয়েছিল বাকারা ক্রিস্টাল গ্লাসে।

যেখানে এই মহাসাড়ম্বরের সঙ্গে উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল তার পাশেই ছিল ইরানের অংসখ্য গরিব লোকের বসবাস। তাদেরকে অভুক্ত রেখে রাজপরিবারের সদস্য আর বিদেশী মেহমান নিয়ে বিশাল রাজকীয় ভোজ উৎসবের আয়োজন মারাত্মক কেলেংকারির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ রেজা শাহের এই রাজকীয় ভোজ উৎসবকে পছন্দ করেন নি। এর প্রতিবাদে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল।

রেজা শাহের ব্যক্তিগত জীবন যেমন ছিল ভোগবিলাসে পূর্ণ, তেমনি যৌন-উন্মত্ততাও ছিল লাগামহীন। তার চরিত্রের এসব অন্ধকার দিকই ইসলামি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সাহায্য করে, বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। জনগণকে বঞ্চিত রেখে নিজের ও পরিবারের কিংবা কাছের লোকজনের ভোগবিলাস আর সম্পদ লুণ্ঠন এবং আমেরিকা, ইসরাইল ও ব্রিটেনের মতো বিদেশী শক্তির তোষণনীতি বিপ্লবের বারুদে পেট্রোল ঢালার মতো ঘটনা হিসেবে কাজ করেছে। বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা ইমাম খোমেইনীকে বার বার নির্বাসনে পাঠিয়েও শেষ রক্ষা হয় নি। রেজা শাহের পতন হয়েছে ঠিকই এবং ইরানের জনগণ তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছে। একাজে বীর ইরানি জাতি লক্ষাধিক প্রাণ কুরবানি দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই ইরানে ব্যাপক আকারে তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় যার মালিক ছিল ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো। ঠিক এই সময়টিতে ১৯৫১ সালে ইরানে গণতান্ত্রিকভাবে প্রথম নির্বাচিত হয় মোহাম্মাদ মোসাদ্দেকের ন্যাশনাল ফ্রন্টের সরকার। ইরানিরা কেবল লাভের ২০ শতাংশই পেতো। ফলে প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক দেশের সব তেলসম্পদ জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ব্রিটেনে তখন উইনস্টন চার্চিল ক্ষমতায় আর আমেরিকায় হেনরি ট্রুম্যান। মোসাদ্দেকের জয়লাভের ফলে দুই ক্ষমতাশালীর মাথায় বাজ পড়ল। শুরু হলো মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করার নীল নকশা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা 'এসআইএস' লন্ডনে বসে যৌথ পরিকল্পনা করল। প্রেসিডেন্ট থিউডর রুজভেল্টের নাতি কার্মিট রুজভেল্ট তখন সিআইএ প্রধান। তিনি উড়ে এলেন লন্ডনে। প্রণীত হলো অপারেশন 'অ্যাজাক্স' এর নীল নকশা। পরিকল্পনা মতে- ইরানি সেনাবাহিনীতে ঘটানো হলো অভ্যুত্থান। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ মোসাদ্দেক ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তার স্থানে আজ্ঞাবহ জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদিকে নিয়োগ দেয়া হলো। কিন্তু মূল ক্ষমতা রাখা হলো ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যের অনুগত মোহাম্মদ রেজা শাহের হাতে। এই ঘটনার একদিনের মাথায় সেনাবাহিনীতে একটি কাউন্টার অভ্যুত্থান হলো। অভ্যুত্থানকারীরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে উদ্ধার করলেন। অন্যদিকে শাহ পালিয়ে গেলেন বাগদাদে এবং তারপর ইতালিতে। কিন্তু এর দুই দিন পর আরো একটি রক্তাক্ত পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটানো হয় সেনাবাহিনীতে। ফলে মার্কিন-ব্রিটেনের নীল-নকশায় অপারেশন অ্যাজাক্স সফল হয় শতভাগ। পরবর্তীতে শাহ ইরানে ফিরে আসে চটজলদি।

এসব ঘটনা ঘটে ১৯৫৩ সালে। পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল শাহের হাতে। তার ইঙ্গো-মার্কিন মদদদাতারা অনবরত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল তাকে। ফলে তার পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রতিদিন রাজপথে শত শত মানুষকে গুলি করে হত্যা করছিল।

১৯৫৩ সালের হস্তক্ষেপটি শুধু ইরানিদেরই তিক্ত অপমান, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিপীড়নের আঘাত দেয় নি; বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এর ব্যাপক প্রভাব রেখেছে।

১৯৫৩ সালের পর থেকে ইরানে বড় রকমের উন্নতি হয়েছিল এবং তাতে জনগণের খুশি বা সন্তুষ্ট থাকার কথা ছিল কিন্তু তারা তা ছিল না। শাহের কতিপয় ব্যক্তিগত আচরণ, অভ্যাস আর পশ্চিমা সংস্কৃতির অবাধ প্রচলন দেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই বিক্ষোভই অগ্নিগর্ভে রূপ নেয় ১৯৭৭ সালের শেষ দিকে। তেহরান শহরে কোনো পাবলিক বাসে কোনো ধর্মীয় লেবাসধারী মানুষ উঠলেই কন্ট্রাক্টর টিটকারি করত। রাস্তায়

রাস্তায় গড়ে উঠেছিল মদের দোকান। শহর ও শহরতলীতে শত শত নাইটক্লাবে চলত সারারাত ধরে ডিস্কো পার্টির নামে মদপান, জুয়া আর অবাধ যৌনাচার।

রেজা শাহ নিজেও ছিলেন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত। তার স্ত্রী, সন্তানরাও পশ্চিমা ধাঁচে চলতেন। শাহ এবং তার স্ত্রী সকল রাজকীয় অনুষ্ঠান এবং দেশী-বিদেশী সরকারি অনুষ্ঠানসমূহে পশ্চিমাদের পোশাক পরতেন। এসব কারণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা দিনকে দিন ফুঁসে উঠতে থাকে।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭৭, এই সময়ে ইরানের বিকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে– কী সাংঘাতিকভাবে রেজা শাহ মার্কিনীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। মার্কিনীদের প্রচেষ্টানুযায়ী এই সময়কালে ইরানি সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ, ইরানি সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে নির্মাণ করেন শাহ, যাকে তিনি 'শ্বেত বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও তার অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইরানে সমৃদ্ধি ও শিল্পায়ন এনেছিল এবং শিক্ষাগত উদ্যোগের ফলে সাক্ষরতার হার বেড়েছিল, কিন্তু এসবই ছিল বিশাল ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ড। সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করা হয় নি, কৃষকদের মধ্যে নগরায়নের প্রভাব লক্ষণীয় ছিল, এমনকি ভিন্নমত পোষণকারীদের রাজনৈতিকভাবে ব্যাপক দমনপীড়ন করা হয়েছিল। ধর্মীয় আলেমরা পশ্চিমা জীবনধারা তাদের ওপর চাপানো হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তারা বুঝতে ও বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, ইসলামকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

১৯৬৩ সালের ১৫ খোরদার যে বিক্ষোভ হয় তাতে ইমাম খোমেইনী সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ফলস্বরূপ তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হন। নির্বাসিত জীবনে ইমাম খোমেইনী বিপ্লবের জন্য আরো বেশি কাজের সুযোগ পেলেন। শাহকে খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করে রেকর্ডকৃত বক্তব্য পাঠাতে লাগলেন দেশে এবং সেসব রেকর্ড ইরানে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে।

ঔপনিবেশিক পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে ইমাম খোমেইনী যুক্তি দেন। কুরআনের ওপর ভিত্তি করে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং উদাহরণস্বরূপ তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন।

ইমাম খোমেইনীর বক্তব্য দিন দিন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং পরিস্থিতি ক্রমেই শাহ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। এ অবস্থায় রেজা শাহ বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনীকে ইরাক থেকে ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠান। সেখানে গিয়েও ইমাম খোমেইনী তার তৎপরতা অব্যাহত রাখলেন। তার রেকর্ডকৃত বক্তৃতার ক্যাসেটগুলো জনগণের মাঝে এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো যে, ইমাম খোমেইনীর অনুসারীরা চূড়ান্ত মাত্রায় উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন এবং বিক্ষোভগুলো ইরানের প্রধান প্রধান শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপক হত্যা, গুম ও ধরপাকড়ের পরেও জনগণকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। শাহের বাহিনী তেহরানের বিশাল জনসমাবেশের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। আপাতত লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় কিন্তু দিবসটি ইরানের ইতিহাসে কুখ্যাত 'ব্লাক ফ্রাইডে' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। ব্লাক ফ্রাইডের পর তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত সিআইএ এজেন্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে সিআইএ হেড কোয়াটারে রিপোর্ট করেন– ৮সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর শাহের শাসন ক্ষমতা এতটাই সুদৃঢ় হয়েছে যে আগামী ১০ বছরে বিরোধী পক্ষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অথচ এর মাত্র ৩ মাসের কিছু সময় পর অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে মাত্র একদিনের গণ অভ্যুত্থানে শাহের পতন হয়। অবশেষে ১৯৭৯ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে ইমাম খোমেইনী বিজয়ীর বেশে ইরানে ফিরে আসেন এবং বিপ্লব চূড়ান্তভাবে সফল হয়।

বিপ্লবের প্রভাব: ইরানের ইসলামি বিপ্লব প্রায় ১৪০০ বছর ধরে চলে আসা খাঁটি মুহাম্মাদি ইসলামের ধারায় সূচিত সংগ্রামগুলোরই অনন্য ধারাবাহিকতার ফসল। আর যে বিপ্লবের ভিত্তিগুলো যত বেশি মজবুত সেই বিপ্লবের স্থায়িত্বও হয় তত বেশি। আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ভিত্তিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন যে বিপ্লবের লক্ষ্য, সেই বিপ্লব মাত্র ৪০ বছরেই বুড়িয়ে যায় না, ঝিমিয়ে পড়ে না; বরং ৪০ বছর তার প্রাণবন্ত যৌবনের সূচনা মাত্র।

রাজনৈতিক ইসলামের পুনরুত্থানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ইরানি বিপ্লবের প্রভাব দেখা যায়। ইরানের সফলতা দেখায় যে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু একটি স্বপ্ন নয়। পশ্চিমা ও তাদের সহযোগী সম্রাট ও স্বৈরশাসকদের ওপর জয় লাভ করা যে সম্ভব তাও ইরান

প্রমাণ করেছে। ১৯৮০ ও ৯০'র দশকে পুরো মুসলিম বিশ্বেই ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো ইরানের ইসলামি বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার মডেল অগ্রগতি এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, এক্ষেত্রে ইসলামি মডেল একমাত্র বিকল্প। দেশে দেশে রাজনৈতিক দলগুলো উদাহরণ হিসেবে ইরানের বিপ্লবের কথাই তুলে ধরত।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে ইউরোপের পরে মার্কিন সরকারগুলোর সঙ্গে শত্রুতা করে কোনো দেশই শক্তভাবে টিকে থাকতে পারে নি কিন্তু ইরান এ ক্ষেত্রে ভিন্ন উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান এমন এক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে যারা বিগত ৪০ বছর ধরে মার্কিন আগ্রাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে টিকে আছে।

গণবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর তা ব্যর্থ করার জন্য ইসলামি এই দেশটির বিরুদ্ধে ইরাকের সাদ্দামকে ব্যবহার করেছে মার্কিন সরকার। ইরানের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোর সামরিক শক্তি ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করেছিল ওয়াশিংটন। আর এজন্য ইরাক ও সৌদি আরবকে উসকে দিয়েছিল হোয়াইট হাউজ। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজনস্কি এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মার্কিন সরকারের উৎসাহ পেয়েই রাজতান্ত্রিক আরব দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইরাকের সাদ্দাম সরকারকে অর্থ সাহায্য দিত। মার্কিন সরকারের উস্কানি বা উৎসাহ পেয়েই সৌদি সরকার তেলের দাম কমিয়ে দিত যাতে ইরানের তেলের দামও কমে যায়। এর ফলে তেহরান যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়।' ব্রেজনস্কি আরো বলেছেন, 'বর্তমানে ইরানের তেল ও গ্যাস বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমেরিকা সেই একই নীতি অনুসরণ করছে।'

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরাকের প্রতি মার্কিন ও আরব দেশগুলোর, এমনকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সব শক্তির সর্বাত্মক সহায়তা সত্ত্বেও বিপ্লবী ইরানি জাতির প্রতিরোধের ফলে ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে ধ্বংস করা বা দুর্বল করার মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। এই যে ইরানি জাতির টিকে থাকার অদম্য শক্তি, এই শক্তির মূলমন্ত্র হলো ইসলামি বিপ্লব।

ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান যেমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সরাসরি 'না' বলে দিতে শিখেছে তেমনি ইরানকে দেখে বিশ্বের বহু দেশ পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বিপ্লবের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে যেমন, তেমনি ব্রিটেন ও ইসরাইলকেও ইরান শত্রুর তালিকায় ফেলেছে। ইরানে বিপ্লব সফল হওয়ার পর ইসরাইল যেভাবে প্রতিরোধ ও সংগ্রামী চেতনার মুখে পড়ছে, এই অবৈধ শক্তিটি আগে কখনই তা দেখে নি।

প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের দুর্বার শক্তি হয়ে উঠেছে লেবাননের হিজবুল্লাহ, ফিলিস্তিনের হামাস ও ইসলামি জিহাদ আন্দোলন। যে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ বা জিসিসি-কে ইরানের বিপ্লব ধ্বংস করার জন্য জোট শক্তি হিসেবে গঠন করা হয়েছিল সেই জিসিসির অন্যতম প্রধান সদস্য কাতার তারই মিত্রদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াল, কুয়েত এবং ওমানের মতো দেশ আমেরিকার প্রধান মিত্র সৌদির একান্ত অনুগত আর নেই। তারা নিজেদের মতো করে অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যে দারিদ্র্যপীড়িত ইয়েমেনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল মার্কিন মদদপুষ্ট সৌদি জোট সেই ইয়েমেন এখন সিংহবিক্রমে লড়ছে মার্কিন অস্ত্র ও প্রযুক্তির বিরুদ্ধে। পারস্য উপসাগর ছিল ইঙ্গো-মার্কিন মিত্রদের স্বর্গরাজ্য। সেই পারস্য উপসাগরে এখন ইরানের সদর্প পদচারণা। অনেকটা ইরানি অনুকম্পা নিয়ে সেখানে থাকতে হচ্ছে মার্কিন বাহিনীকে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মার্কিন সেনাদের। বিপ্লবের আগে যেখান ইরানের সরকার ছিল নিতান্তই নতজানু ও পরনির্ভরশীল সরকার, সেখানে ইরান এখন সামরিক, কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দিব্যি বিশ্বের বড় বড় শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। ইরানি ক্ষুরধার কূটনীতির কাছে প্রতিনিয়ত নাকানি-চুবানি খাচ্ছে পশ্চিমা শক্তি বিশেষ করে আমেরিকা। ইসলামি বিপ্লব ইরানকে কতটা শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে তার চূড়ান্ত নজির হচ্ছে ইরাকে মার্কিন ঘাঁটিতে ঘোষণা দিয়ে ইরানি সামরিক বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একমাত্র ইরানের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। ইরানের এই সক্ষমতায় বহু বন্ধুদেশ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চায়, তারাও বুঝতে শিখেছে কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়। এই প্রচেষ্টা মোটেই অসম্ভব নয় বরং এখন বাস্তবতা। এর সবই সম্ভব হয়েছে ইরানের মহান ইসলামি বিপ্লবের কারণে।

লেখক : সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক